International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-V, March 2016, Page No. 34-37
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নদীয়ার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের বৈচিত্র্য, স্বকীয়তা, রীতি, শৈলী এবং অলংকরণের বিষয় ও মোটিফ

তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Nadia is one of the important district of West Bengal, which is famous for its art, culture and education. It has some important places of pilgrimage and ancient learning like Nabadwip, Shantipur and Mayapur, places of historical interest like Ballal Dhipi, battle ground of Plassey, Krishnanagar Rajbari, birth place of the famous poet Krittibas at Fulia, famous traditional clay doll craft zone of Ghurni. This is the land of Lord Chaitanya. Sri Chaitanya was not only a religious leader preaching Vaishnab ideas and Bhakti cult but also a social reformer in the 16th Century of Bengal. Moreover, the district of Nadia is historically and culturally significant. There are a number of temples and pilgrimage centres. There are several important terracotta temples situated in this district and these are architecturally wonderful. Some of the important terracotta temples are Kali Temple of Palpara, Shiva Temple of Kamalpur of Chakdaha, Pancharatna Radhakrishna Temple of Birnagar, Jaleswara Temple and Shyam-Chand Temple of Shantipur, Raghaveswara Temple of Dignagar, Raj Rajeswar Temple of Shivniwas of Krishnaganj block etc. Most of the temples are ornamented with beautiful terracotta art. Particularly terracotta plaques fixed on temples comprises valuable elements for reconstructing the mythological, historical and socio-cultural heritage. In this paper, we have discussed the styles, types, themes, designs and motifs of the selected terracotta temples of Nadia district from the viewpoint of folklore and archaeology.

Keywords: Terracotta, Temple, Architecture, Heritage, Motif, Plaque

১. ভূমিকা: ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যে মন্দির-স্থাপত্য যথেষ্ট গৌরবময়। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলে অবস্থিত মন্দির-স্থাপত্যের শিল্প নৈপুণ্যের মাধ্যমে গরিমাময় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অসাধারণ নৈপুণ্য ভারতের পূর্ব ও উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত রাজ্যগুলিতে ভীষণভাবে দেখা যায়। যেমন: পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য অবিভক্ত বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শন দেখা যায়। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে এইসব মন্দির-স্থাপত্যের সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মন্দির-স্থাপত্য শৈলীর বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য। মাটিকে পুড়িয়ে টেরাকোটার ফলক নির্মাণ করে

এই ধরনের মন্দির তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন রীতির টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য লক্ষিত হয়। ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের বহু নিদর্শন দেখা যায় নদীয়া জেলাতে। বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় স্থাপত্যের ধারা অনুসরণ করে নদীয়া জেলায় বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

২. বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য: বাংলার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু কাল আগে থেকে বাংলার নানা স্থানে যে অসংখ্য মন্দির তৈরি হতে থাকে, সেগুলির স্থাপত্যগত বৈচিত্র্য ও টেরাকোটার অলংকরণ বাঙালির স্থাপত্য ও শিল্পচর্চার মহান উত্তরসুরীরূপে উপস্থিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসাবে মন্দিরগুলি তৈরি হয়নি, এগুলি ছিল দক্ষ শিল্পীদের শিল্প-চর্চার সার্থক উদাহরণ। যুগ যুগ ধরে পল্লী ও শহরের আনাচে কানাচে, নদীর ধারে কত বিচিত্র ধরনের মন্দিরের জন্ম হল এবং বহু মন্দিরের দেওয়াল টেরাকোটা শৈলীতে সজ্জিত হল, যেগুলির সঠিক সংখ্যা আজও নিরূপিত হয়নি। কালের প্রকোপে অজস্র মন্দির অর্থাৎ দেবসৌধ আনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

পশ্চিমবাংলার টেরাকোটার মন্দিরগুলিকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: চালা, রত্ন, দেউল এবং চাঁদনি দালান। 'চালা' মন্দিরের ধারণাটি এসেছিল বাঙালির অতি পরিচিত খড়ের চালা ঘর থেকে। 'চালা' মন্দিরের সঙ্গে 'চাঁদনি', 'দালান' প্রভৃতি শৈলীর মন্দিরের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও 'চাঁদনি' ও 'দালানের' ছাদ সমতল, কিন্তু চালার চাল ঢালু। চালা, চাঁদনি ও দালানের মধ্যে সরল সাদামাটা স্থাপত্য চিন্তাই বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য রীতি। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই রীতির বাসগৃহ তৈরি হয়ে এসেছে। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় 'রত্ন' শৈলীর মাধ্যমে। কিন্তু চূড়া বা রত্ন বসাবার একটা রীতি ছিল। এর ফলে উদ্ভব হল এই 'রত্ন' স্থাপত্যের কয়েকটি শ্রেণি, যেমন: একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন ও পঞ্চবিংশতিরত্ন প্রভৃতি।
এইসব মন্দির পলিমাটিতে গড়া শস্যশ্যামল বাংলার একান্ত নিজস্ব, যা লোকশিল্পীদের দ্বারা নির্মিত। এইসব স্থাপত্য রীতি বাঙালি সংস্কৃতির এক উন্নত আলোকদ্ভোবাসিত চিত্রকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। মন্দির সজ্জার জন্য টেরাকোটা একটি পৃথক শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছুকালের মধ্যেই এই শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। মূর্তিফলকগুলিতে গ্রামীণ সামাজ- জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে; যেমন সাজ, তেমনই মূর্তিগুলির বেশভূষা ও আকারে রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের বিচিত্র প্রকাশ। এই মন্দিরগুলি বাঙালির নিজস্ব কল্পনাতেই সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলিকে তাই ধর্মীয় মোড়কে পোড়া 'আফিং' মনে করে তাচ্ছিল্য না করে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। হাজার হাজার মন্দির রাঢ় বাংলার নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলি শিল্পরসিক ও পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয় বিষয়।

বাংলার যে মন্দির চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল তার চরম উৎকর্ষ বাঁকুড়াতেও লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত মল্লরাজাদের আনুকূল্যেই এখানে এই শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বিষ্ণুপুর তো বটেই, বিষ্ণুপুরের বাইরে ইঁট ও পাথর উভয় উপাদানেই নির্মিত চালা, রত্ন ও দেউল মন্দিরের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন দেখতে নপাওয়া যায়। ওড়িশা ও বাংলা-- এই দুই শৈলীর মন্দিরের অভূতপূর্ব বিকাশ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুর জেলায় টেরাকোটা মন্দির শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে পূর্বোক্ত দুটি নির্দিষ্ট শৈলীর মাধ্যমে।

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি ও পলিমাটি অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় অর্থাৎ হুগলি, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় শেষ মধ্যযুগে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এগুলির কিছু কিছু টেরাকোটা অলংকরণেও সমৃদ্ধ। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এগুলি বেশিরভাগ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের অনুরূপ, ইঁটের মন্দিরই বেশি। পাথরের মন্দির নেই বললেই চলে। গাঙ্গেয় সমভূমির সহজলভ্য ও পলিমাটিতে গড়া এই মন্দিরগুলিতে কোমলতা ও সৌকুমার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকার এই অঞ্চলকে 'মন্দিরের হৃদয়ভূমি' বলা যায়। উত্তরবঙ্গের মালদা,

দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে খাটি বাংলা রীতির টেরাকোটা মন্দিরের সংখ্যা অনেক বেশি।

উল্লিখিত শৈলীর মন্দির ছাড়া পশ্চিমবাংলার আরও চার ধরনের শৈলী পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি হল চাঁদনি, দোল ও রাসমঞ্চ। চাঁদনি ও দালান-- দুটিই সমতল ছাদযুক্ত সৌধ। রাসমঞ্চ শৈলীর স্থাপত্যকে রত্ন শৈলীও বলা যায়; কেননা গোলাকার বা বর্গক্ষেত্রাকার উচ্চ মানের ওপর অবস্থিত সবদিক উন্মুক্ত সৌধটির ছাদের চারপাশে যে চূড়াগুলি স্থাপন করা হতো, সেগুলি বেশিরভাগই ছিল বেহারি রসুনের মতো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাসমঞ্চে 'রেখা' দেউল বা 'পিড়া' রত্ন স্থাপিত হতে দেখা গেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গির্জার কোনাকৃতি টাওয়ারের মতো করেও এর রত্নগুলি তৈরি হতো। বর্তমানে বেশিরভাগ মন্দিরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। অবহেলা অনাদরে বাংলার এই প্রাচীন শিল্প বর্তমানে ধ্বংসের পথে। কিছু কিছু প্রসিদ্ধ মন্দির সংরক্ষিত করা হলেও বেশির ভাগই জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরগুলি রং করে টেরাকোটার আসল রূপকে নষ্ট করা হয়েছে। নদীয়া জেলাতে অবস্থিত বেশির ভাগ মন্দিরে এই ঘটনা ঘটেছে।

৩. নদীয়ার মন্দির টেরাকোটার ইতিহাস: অবিভক্ত বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন অঞ্চল হল নদীয়া। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই অঞ্চলের সুনাম পূর্বে থেকেই রয়েছে। সমতল পলিমাটি যুক্ত নদীয়া জেলার কোন সুপ্রাচীন ইতিহাস জানা যায় না; আজ পর্যন্ত কোন সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনও আবিস্কৃত হয়নি। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে বিক্ষিপ্তভাবে পাল-সেন যুগের ভগ্ন মূর্তি। নদীয়ায় পাল-সেন যুগে নির্মিত উল্লেখযোগ্য তেমন কোন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে অনেকে মনে করেন। তা হলে কি সে যুগে এই জেলায় কোন মন্দির নির্মিত হয়নি বা হয়েছিল কিন্তু বিধ্বংসী জলচ্ছাস, প্লাবন নদীর তটক্ষয় বা গতি পরিবর্তন এবং ইসলাম যুগের ব্যাপক ধ্বংসলীলায় এই সকল মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বলে অনুমান করা হয়। শ্রীচৈতন্য জীবনীমূলক এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে নদীয়ার কোন মন্দিরের উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা হয় প্রাচীনতম মন্দিরগুলি তার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কোন পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায় নি। ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রের অগ্রগতি ছিল রুদ্ধ। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর্বিভাবের ফলে সূচিত হল এক নবজাগরণের; যার ফলে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্যে বিকশিত হতে শুরু করল নতুন উদ্দীপনায়। নদীয়ার মন্দির-স্থাপত্যগুলি বাংলার নিজস্ব মন্দির-স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত হলেও সেগুলি কেবলমাত্র দেবস্থান ছিল না, এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপাদানও ছিল। এই জেলার সবচেয়ে প্রাচীনতম মন্দিরটি পালপাড়ায় অবস্থিত। মন্দিরটি চারচালা রীতির, এর উচ্চতা ৬০ ফুট মতো। মন্দিরের অলংকরণে টেরাকোটার কারুকার্য পরিলক্ষিত হয়।

নদীয়ায় সপ্তদশ, অষ্টদশ এবং ঊনবিংশ শতকে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের নির্মাণ হয়। নদীয়ার রাজারা এবং অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন বা পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই জেলায় নানান শৈলীর মন্দির-স্থাপত্য পরিলক্ষিত হয়। তবে আটচালা মন্দিরের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। নদীয়ার বহু দক্ষ কারিগর মন্দির-টেরাকোটা শিল্পের সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। সূক্ষ পোড়ামাটির অলংকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো এসব দেবালয়ে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত সহ নানান পৌরাণিক কাহিনী, নানা ধরনের সামাজিক ও লৌকিক চিত্র, জ্যামিতিক এবং ফুলকারী নক্শার চিত্র টেরাকোটার ফলকে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত নদীয়ার অনেক মন্দির আজ যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে লুপ্ত হয়ে গেছে। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ বেশ কিছু মন্দির তাদের অধীনে নিয়েছে ঠিকই কিন্তু কয়েকটি মন্দির তারা সংরক্ষণ করলেও বেশিরভাগ মন্দিরেই সেভাবে কোন কাজই হয়নি।

৪. নদীয়ার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য: পরিচয়, বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা: অবিভক্ত বঙ্গদেশে তথা রাঢ় অঞ্চলে নদীয়া জেলা একটি বড় জেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দেশ ভাগের পর পূর্বের নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে বর্তমানে নদীয়া জেলা গঠিত হয়। এই জেলার সদর শহর হল কৃষ্ণনগর। নদীয়া নামকরণের ক্ষেত্রে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল: 'নব' শব্দটি ফরাসী ভাষার

'নও' আর 'দিহ' শব্দের অর্থ হল বাসস্থান। বিদেশী ভাষায় 'নওদিয়াহ" বা 'নোদিয়াহ' এর বাংলা অপভ্রংশ, নদীয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে, আবার 'দিয়াহ' শব্দের হিন্দুস্থানী অপভ্রংশ হল 'দিয়ারা'। [১]

ত্রয়োদশ চর্তুদশ শতক থেকে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প চর্চা কিছুটা স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য শৈলী হিসাবে শিখর ও পীড়া দেউল নির্মাণ এইসময় একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেইসময় অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মন্দির নির্মাণ করা সম্ভবপর ছিল না। নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্য আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম যে দুটি বিষয়ের কথা মনে আসে তা হল সুবর্ণ বিহার ও বল্লাল সেনের ঢিবির কথা। বর্তমানে এই দুটি স্থানই ধ্বংসপ্রাপ্ত। মধ্যযুগের শেষের দিকে বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের নিজস্ব ধারাকে অনুসরণ করে এই জেলায় বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের নানা রীতিকে অবলম্বন করে। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যা নিম্নরূপ:

মধ্যযুগের বাংলার মন্দির-স্থাপত্য

বিভিন্ন স্থাপত্য রীতিকে অবলম্বন করে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে নানান ধরনের টেরাকোটা মন্দির তৈরি হয়েছিল, নিম্নে তার একটি তালিকা তুলে ধরা হল:

মন্দির	রীতি	স্থান	থানা	উপাস্য দেব-দেবী
শ্রীকৃষ্ণ জিউ মন্দির	আটচালা	কাঞ্চনপল্লী	কল্যাণী	কৃষ্ণরায়
আটচালা শিব মন্দির	আটচালা	কামালপুর	চাকদা	শিব
আটচালা শিব মন্দির	আটচালা	মাঝেরগ্রাম	নাকাশিপাড়া	শিব
শ্যামরায় মন্দির	দালান	ঘোড়াইক্ষেত্র	কালীগঞ্জ নাকাশিপাড়া	কৃষ্ণ
জোড়বাংলা মন্দির	জোড়বাংলা	তেহট্ট	তেহট্ট	কৃষ্ণ
রাঘবেশ্বর মন্দির	চারচালা	দিকনগর	কোতোয়ালী	রাঘবেশ্বর শিব
শিব মন্দির	দালান	দোগাছি	কোতোয়ালী	শিব
একরত্ন কালী মন্দির	একরত্ন	পালপাড়া	চাকদহ	কালী
শিব মন্দির	চারচালা	বহিরগাছি	নাকাশীপাড়া	শিব
শিব মন্দির	আটচালা	বাগআঁচড়া	শান্তিপুর	শিব
বিল্ল পুস্করিণী	আটচালা	বেলপুকুর	কোতয়ালী	শিব
রাধাকৃষ্ণ মন্দির	পঞ্চরত্ন	বীরনগর	রাণাঘাট	রাধাকৃষ্ণ
সিদ্ধেশ্বরী	দালান	দক্ষিণপাড়া	রাণাঘাট	কালীমন্দির
জলেশ্বর মন্দির	চারচালা	শান্তিপুর	শান্তিপুর	জলেশ্বর
শ্যামচাঁদ মন্দির	আটচালা	শান্তিপুর	শান্তিপুর	শ্যামচাঁদ
শিব মন্দির	চারচালা	শ্রীনগর	চাকদহ	শিব

এবারে নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মন্দির-স্থাপত্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা যেতে পারে:

নদীয়া জেলার কল্যাণী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনপল্লীর শ্রীকৃষ্ণ জিউ বা কৃষ্ণরায়ের মন্দিরটি একটি উল্লেখযোগ্য টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের আটচালা রীতির টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন বলে পরিগণিত করা যায়। কৃষ্ণরায়ের মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৪৯ ফুট মতো (চিত্র-১)। মন্দিরটির কাছে প্রাচীরের বাইরে একটি আটচালা দোলমঞ্চও রয়েছে। এই মন্দিরে ভাস্কর্য হিসাবে মন্দিরে প্রবেশের প্রধান দরজার কাঠের ওপর নানাবিধ পৌরাণিক নক্‌শা খোদিত আছে। সমগ্র মন্দিরে ছোট বড় নানা পোড়া মাটির অলংকরণ দেখা যায়। প্রতিষ্ঠা ফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় ১৭৮৬ সালে কলকাতার নিমাই চরণ ও গৌরচরণ মল্লিক ভাতৃদ্বয় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

চাকদহ থানার অন্তর্গত কালামপুরের আটচালা শিব মন্দিরটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটির প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মন্দিরটি ইঁট দ্বারা নির্মিত এবং তার ওপর পোড়ামাটির অলংকরণ রয়েছে। মন্দিরটি বহুকাল যাবৎ ভগ্ন অবস্থান রয়েছে। ইঁট খোদাই করা দীর্ঘ এক লিপি ফলক এই মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উত্তর ও দক্ষিণে দেওয়ালের কার্নিশের নীচে বরাবর যে লিপি ফলকের কিছু কিছু অংশ বর্তমানেও রয়েছে কিন্তু তা পাঠোদ্ধার আজ আর সম্ভব নয় (চিত্র-২)।

পালপাড়ার একরত্ন কালী মন্দিরটি এই জেলার সর্বপ্রাচীন মন্দির। পালপাড়া নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার চাকদহ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। পালপাড়ার মন্দির সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে: "এ জেলার সকল মন্দির কালের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে জেলার গৌরব ঘোষণা করেছে তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান ঐশ্বর্যশালী মন্দির হল পালপাড়ার মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ফলক না থাকায় নির্মাণকাল জানা যায় না।"[২] এই মন্দিরটির আনুমানিক উচ্চতা ৪০ ফুট মতো। এই দেবালয়ের প্রবেশদ্বার দক্ষিণমুখী। আয়তনে ও পোড়ামাটির অলংকরণে এটি যে নদীয়া জেলার শ্রেষ্ঠ মন্দির তাতে সন্দেহ নেই, মন্দিরটিতে অর্থবহ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি ত্রিশূল রয়েছে। শিব শক্তির মিলনের প্রতীক রূপে অনুমিত এ-ধরনের ত্রিশূল বিরল। মন্দিরটি আনুমানিক ৩০০ বছরের পুরানো। ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানা যায় এই মন্দিরটি পালপাড়ার রাজা সোমেশ্বরের বংশধর গর্ন্ধব রায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় (চিত্র-৩ও ৪)।

নদীয়া জেলার আরো একটি টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল কালীগঞ্জ থানার ঘোড়াইক্ষেত্র গ্রামের শ্যামরায়ের দালান মন্দিরটি। ১৭১০ সালে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্বে মন্দিরটি দোচালা ছিল; কালক্রমে এই দোচালা মন্দিরটি লুপ্ত হয়ে সেই স্থলে স্থাপিত হল এই দালান মন্দিরটি। বর্তমানে এই মন্দিরও ভগ্নপ্রায় এবং পরিত্যক্ত। এই দালান মন্দিরের জীর্ণ দেওয়ালে এখনও কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত টালিগুলি পূর্বতন শ্যামরায়ের দোচালা মন্দিরের।

নাকাশীপাড়া থানার মাঝেরগ্রামের পশ্চিমমুখী আটচালা শিব মন্দিরটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটির উচ্চতা ১২ ফুট। ১৭৪৯ সালে মাঝের গ্রামের মজুমদার বংশীয়রা এই গ্রামে পর পর তিনটি আটচালা শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই আটচালা মন্দিরগুলি পশ্চিমমুখী, পূর্বে এই সকল মন্দির গাত্রে পোড়মাটির মূর্তি ও অলকংকরণ ছিল কিন্তু সংস্করণের অভাবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেইসব এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বহিরগাছির মন্দিরটি নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত। মন্দিরের উপাস্য দেবতা হলেন শিব। পূর্বে এখানে ১২ টি শিবমন্দির ছিল কিন্তু বর্তমানে ১ টি রয়েছে। দেবালয়টি বহুবার নানাভাবে সংস্কার করা হয়েছে।

তেহট্টের পূর্বের নাম ত্রিহট্ট। তেহট্টের উল্লেখযোগ্য মন্দির-স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হল ঠাকুর পাড়ার কৃষ্ণ রায় বিগ্রহের জোড়বাংলা মন্দিরটি। এই মন্দিরটি নদীয়া জেলার টেরাকোটার মন্দিরের মধ্যে অন্যতম। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী অর্থাৎ মন্দিরের প্রবেশের পথ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দেবালয়ের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির হরফে উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠা লিপি পাঠোদ্ধার

করে জানা যায় ১৬০০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মসেবী মহান পুরুষ রামদেব, লক্ষীদেবী যাঁরা পদসেবা করেন তাঁর উপাসনার জন্য, যত্নের সঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তমের এ মন্দির নির্মাণ করেন।

কৃষ্ণনগর মহকুমার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত দিকনগর গ্রামে একটি চারচালা রাঘবেশ্বরের টেরাকোটা মন্দির দেখা যায়। দেবালয়টির প্রবেশপথ পশ্চিমমুখী। মন্দিরটির উচ্চতা আনুমানিক ৩০ ফুট মতো। রাজা রাঘব রায় সম্ভবতঃ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দিরে রাঘবেশ্বর শিবলিঙ্গের নিত্যপূজা হয়। বর্তমানে এই মন্দিরটি অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় রয়েছে (চিত্র-৫)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত অনেক টেরাকোটা মন্দিরই আজ ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে (চিত্র-৬)। দোগাছির দালান রীতির শিব মন্দিরটি এই জেলার কৃষ্ণনগর মহকুমার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট মতো। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার বর্তমানে পশ্চিমমুখী হলেও অতীতে পশ্চিমদিকে একটি প্রবেশ দ্বার ছিল। দোগাছিতে পোড়ামাটির অলংকরণ যুক্ত শিব মন্দিরের অন্তিম পর্যায়ের শিখর দেশ এতটাই ভগ্ন ছিল যে মন্দিরটি পূর্বে চারচালা দেবালয় ছিল সেটা অনুমান করে নিতে হয়। দোগাছির মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে নদীয়ার মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে: "বর্তমানে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন একটি চারচালা মন্দিরের অস্তিত্ব দো-গাছিয়া গ্রামে ছিল। মন্দিরটি টেরাকোটা অলংকারণে সমৃদ্ধ ছিল। এইসব টেরাকোটার মধ্যে মিথুন দৃশ্য, কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ ও মৎস্যবতারের চিত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কয়েকজন যোদ্ধার মূর্তি ছিল। আনেকে একটি রাঘবেশ্বর মন্দিরের সমকালীন মনে করেন।"[৩]

চিত্র-১: শ্রীকৃষ্ণ জিউ মন্দির, কাঞ্চনপল্লী

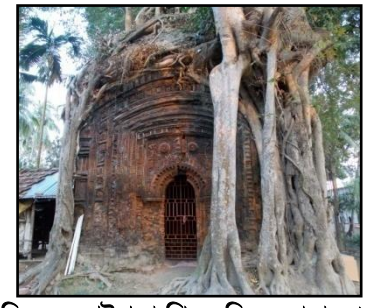

চিত্র-২: আটচালা শিব মন্দির, কামালপুর

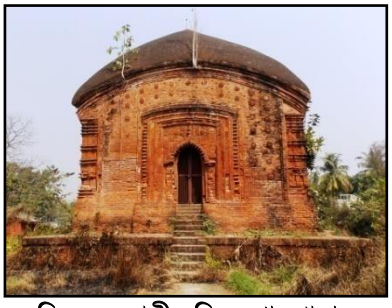

চিত্র-৩: কালী মন্দির, পালপাড়া

চিত্র-৪: কালী মন্দিরের সম্মুখ ভাগ, পালপাড়া

চিত্র-৫: রাঘবেশ্বর মন্দির, দিকনগর

চিত্র-৬: ভগ্নপ্রায় টেরাকোটার মন্দির

রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত বীরনগরে পঞ্চরত্ন রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। এই মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। আগাছা আচ্ছাদিত দেবালয়টির উপরের চালা ও সামনের অংশের উপরিভাগ বিধ্বস্ত। রাণাঘাটের দক্ষিণমুখী জোড়া শিব মন্দিরটি রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত রাণাঘাট শহরে অবস্থিত। এই মন্দিরদ্বয়ের সামনে অলিন্দ নেই। দুটি মন্দিরেই কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ নিত্য পূজিত হয় মন্দির প্রবেশ পথের খিলান পত্রাকৃতি অর্থাৎ খিলানের নীচের দিক ছোট ছোট ঢেউ খেলানো।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর একটি প্রাচীন স্থান। রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত পৌরশহর হল শান্তিপুর। শান্তিপুরে মতিগঞ্জের বেজ পাড়ায় একটি চারচালা জলেশ্বর শিব মন্দির দেখা যায়। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, এর উচ্চতা ২১ ফুট মতো। এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা হলো কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। শিবলিঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। গর্ভগৃহের একটি কুলুঙ্গিতে অভয়াতারিণী দুর্গার পিতলের দ্বিভূজা এবং ত্রিনয়ণী মূর্তি রক্ষিত। জলেশ্বর মন্দিরটির অলিন্দ বিলীন চারচালা রীতির মন্দির, মন্দিরের দুটি দরজার উপরেই নক্শা অলংকরণ যুক্ত। শান্তিপুরের আর একটি উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার আটচালা রীতির মন্দির হল শ্যামচাঁদ মন্দির (চিত্র-৭)। এছাড়া এখানে রয়েছে আনন্দময়ী মন্দির **(চিত্র-৮)**। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের শিবনিবাসে একটু ভিন্ন গঠন-রীতির মন্দির দেখা যায়। এখানে গথিক স্থাপত্য রীতির দুটি টেরাকোটার মন্দির রয়েছে, যেগুলি হল অষ্টকোণাকৃতির রাজরাজেশ্বর মন্দির ও চতুষ্কণাকৃতির রাজ্ঞীশ্বর মন্দির (চিত্র-৯)।

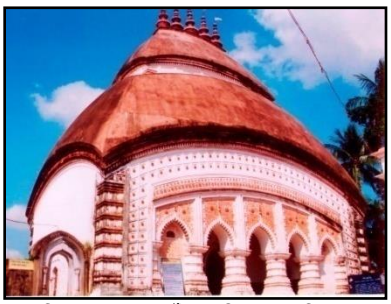

চিত্র-৭: শ্যামচাঁদ মন্দির, শান্তিপুর

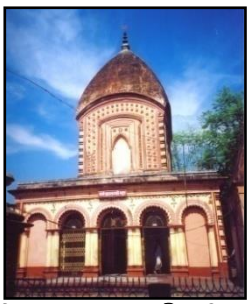

চিত্র-৮: আনন্দময়ী মন্দির, শান্তিপুর

চিত্র-৯: শিবনিবাসের শিব মন্দির, কৃষ্ণগঞ্জ

নদীয়ায় আরো অজস্র টেরাকোটার মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায়, যা আজও পুরাতত্ত্ববিদ এবং পর্যটকদের বিস্ময়াভূত করে। অনেক মন্দিরই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর যেগুলি বর্তমান রয়েছে সেগুলির সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ অনেক মন্দির সংরক্ষণ করবে বলে স্থির করেছে কিন্তু সঠিকভাবে এখনও তা করেনি।

৫. টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের রীতি, শৈলী ও ফলকের মোটিফ ও বিষয়বস্তু: নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্য মিশ্র শৈলীর। এখানকার মন্দিরগুলি বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের নিজস্ব শৈলী দ্বারা নির্মিত। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায় যথা: নাগর, বেসর, শিখর, দ্রাবিড়। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের রীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: "ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যকে যে নির্দিষ্ট চারটি শৈলীতে ভাগ করা যায় তা আনুমানিক খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতক থেকে সুলতানী আমলের মধ্যেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত নির্মিত হতে থাকে। এগুলির মধ্যে প্রথমটি হলো, ইন্দো আর্য বা উত্তর ভারতীয়। নাগর শৈলীর বিশুদ্ধ রূপ আমরা ভুবনেশ্বরের আদি মন্দিরগুলিতে পাই। এই সময়ই গুপ্তযুগে উদ্ভাবিত উত্তর ভারতীয় শিখর এর রূপটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।"[৪] খ্রীষ্টীয় অষ্টম নবম শতকের মন্দিরগুলিতে শিখরের পূর্ণরূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। মুখমণ্ডল বিবর্জিত শিখর দেউলের যে সৌন্দর্য তা পালযুগে নির্মিত হয় বলে মনে হয়। শিখর মন্দিরে কখনও কখনও গর্ভগৃহও লক্ষ্য করা যায়। পাল সেন শাসনাধিনের বাংলার নাগর, শিখর শৈলীর একটি স্বতন্ত্র রূপ পরিস্ফুট হয়, এর সঙ্গে ওড়িশী রীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট। পাল সেন আমলে বিশেষ করে সেন শাসনাধিকারে এই আঞ্চলিক পূর্বী রীতির শিখর দেউলও নেহাৎ কম ছিলো না এবং এই সময় বেশ কিছু মন্দির ও প্রাসাদ সৌধও নির্মিত ছিল। সেগুলি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়। সুলতানী শাসনকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সবথেকে বেশি। বিশেষ করে সুউচ্চ শিখর মন্দিরগুলি এই ধরনের উচ্চ মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে যেগুলিও ধ্বংস করা হয়।

বাংলার মন্দিরশিল্প ধারার চতুর্থ বিভাগটি হল তার নিজস্ব রীতি চালা, এর উদ্ভব বহু প্রাচীন কালের। মধ্যযুগে এই চালা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার গ্রামাঞ্চলের কাঠ, বাঁশ, খড়ের চাল দেওয়া মেটো ঘর বা পাতলা খড় বা খড়ের ঘর বহু

প্রাচীন কাল থেকেই সাধারণ মানুষের বাসস্থানরুপে ব্যবহৃত আবাসগৃহে দেবমন্দির রুপে স্বীকৃত হয়েছিল। একে কেউ কেউ লোকায়ত বা লোকস্থাপত্য, বা ফোক আর্কিটেকচার বলে উল্লেখ করেছেন।[৫]

মধ্যযুগে বাংলার ঐতিহ্যাশ্রয়ী স্থাপত্য শিল্পকে পাঁচ ভাগে আমর ভাগ করতে পারি, যথা: শিখর, পীঢ়া, চালা, রত্ন, দালান। নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্য প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে: "নদীয়া জেলার কোন শিখর দেউল নেই এবং ভদ্র বা পীঢ়া দেউলের সংখ্যা মাত্র একটি। চালা মন্দিরের বিভাগগুলি হল: দো-চালা, জোড়-বাংলা, চার-চালা, আট-চালা প্রভৃতি। নদীয়া জেলায় দো-চালা মন্দির একেবারেই অনুপস্থিত এবং জোড়-বাংলা মন্দিরের সংখ্যা মাত্র দুটি। অধিকাংশ মন্দির চার বা আট চালা। রত্ন মন্দির গোষ্ঠীকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়- একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন ও পঞ্চবিংশতিরত্ন। নদীয়া জেলায় কয়েকটি একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের অস্তিত্ব আছে। নদীয়া জেলার দালান মন্দিরের সংখ্যাও প্রচুর।" [৬] এই আলোচনার সূত্রে নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্যকে নিম্নরূপ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,যেমন: একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, চারচালা, দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ, জোড়বাংলা, আটচালা। নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত টেরাকোটা মন্দির রয়েছে তার নানা ধরণ রয়েছে, যেমন চালা, জোড়বাংলা, রত্ন ইত্যাদি। আকারগত দিক থেকে এ-ধরনের বিভাজন হয়ে থাকে। এইসব মন্দিরগুলিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তার শৈলীও বিচার করা যায়।

শৈলী: পাথরের অভাবে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পোড়া মাটির স্থাপত্য ও মূর্তি নির্মাণের প্রচলন হয়। এই অঞ্চলে মন্দির-স্থাপত্যের উপযোগী পাথরের অভাবে ছোট ছোট হালকা ইঁট দিয়ে মন্দির নির্মিত হয়। মন্দির হল স্থায়ী উৎসর্গের নিদর্শন। এই মন্দিরগুলি বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছে। সাধারণভাবে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। পর্যায়গুলি হল-হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ও ইংরেজ যুগ। প্রাচীন বাংলায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোটামুটিভাবে চার ধরনের মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দির নির্মাণের এই রীতিগুলি হল ভদ্র বা পীড়া দেউল, রেখ বা শিখর দেউল, স্তূপ শীর্ষ পীড়া, ভদ্র দেউল এবং শিখর শীর্ষ পীড়া। মুসলমান শাসনকালে যেসব স্থাপত্য রীতি দেখা যায় তা হল রেখ দেউল, চালা দেউল, বাংলা মন্দির, রত্ন মন্দির এবং শিখর যুক্ত মন্দির। আবার ইংরেজ আমলে মন্দির-স্থাপত্যে ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বিদেশী ভাবধারার মিশ্রণ মন্দিরের গঠন ও অলংকরণে ভিন্ন রূপ দেখা যায়। যেমন মন্দির গাত্রের ফলকে নীলচাষ, পর্তুগীজ জলদস্যু, ইংরেজ সৈন্য, মেমসাহেব ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। নদীয়ার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলিকে স্থায়ী উৎসর্গের নিদর্শন হিসাবে আমরা ধরতে পারি। এইসব মন্দির-স্থাপত্য শৈলীগত উৎকর্ষে ও শিল্প সক্রিয়তায় সমুজ্জ্বল। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে চর্তুদিকে জুড়ে রয়েছে টেরাকোটার নতোন্নত খোদাই করা ইঁট। প্রতিটি ইঁট অত্যন্ত নিপুণভাবে স্থাপত্যের খাঁজে খাঁজে রাখার উপযোগী হিসাবে গণিতের ছকে তৈরি। আর সেই ছকের মধ্যেই নতোন্নত খোদাই করে এক একটি বিষয়কে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখানকার মন্দিরগুলিতে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অপরূপ মেলবন্ধন লক্ষিত হয়, যা মন্দির-স্থাপত্যের শিল্পগুণকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। মন্দির গাত্রে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক যুক্ত রয়েছে চৌকা ও জ্যামিতিক আকারে বিভাজিত প্যানেল। প্রতিটি ফলকের চর্তুদিকে বর্ডার বা সীমারেখা থাকার ফলে এগুলি যে প্রকৃতপক্ষে স্থাপত্য নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইঁট তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ফলকগুলি দেখে বোঝা যায় প্রতিটি ফলক নির্মাণকালে কোথায় প্রতিস্থাপন করা হবে এবং দর্শকেরা কোথায় থেকে দেখবে তা বিবেচনা করা হয়েছে। ফলকগুলির নক্শা ও বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে নানান প্রতিকী তাৎপর্য ধারা পড়ে। নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্য প্রসঙ্গে নিম্নের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "নদীয়া জেলার মন্দিরগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধারা লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায়। চিরাচরিত বাংলার স্থাপত্য শৈলীতে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। অন্তঃত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ ধারা বলবৎ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হতে স্থাপত্যরীতির বিচ্যুতি ও টেরাকোটা অলংকরণের ব্যবহার প্রায় প্রচলিত হয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকে নদীয়া জেলার নির্মিত মন্দিরগুলি মন্দির-ভাস্কর্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, এইসব মন্দিরে টেরাকোটার ফলকগুলি মূর্তি ও নকশা অতি সূক্ষ, সুন্দর ও গভীরভাবে খোদিত। মূর্তিগুলির দেহের ঋজুতা ও বলিষ্ঠ আকারে অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু

কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে মন্দির ও প্রাসাদ স্থাপত্যে ইউরোপীয় তোরণ নির্মাণে মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে এবং টেরাকোটার পরিবর্তে সুন্দর সুন্দর পঙ্খের কাজের প্রচলন দেখা যায়।"[৭]

নদিয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে বাংলার টেরাকোটা শিল্পের ঐতিহ্যময় শিল্প শৈলীকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শিল্পকর্ম নান্দনিক প্রেক্ষিতে অপরূপ, ধর্মের প্রয়োজনে এই স্থাপত্যগুলি সৃষ্টি হয়েছে। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য শিল্পের আর একটি বিশেষ দিক হল Idealistic এবং Timelessness, তাই এই শিল্প শাশ্বত। সামগ্রিক বিচারে এই শিল্পরীতি লৌকিক। পুরাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্য অনন্য।

স্বকীয়তা: নদীয়া জেলায় অসংখ্য টেরাকোটার মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায়। কালের গতিতে এবং সঠিক সংরক্ষণের অভাবে অনেক মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলেও এখনো বেশ কিছু মন্দির সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। আলোচ্য জেলার মন্দির-স্থাপত্যের বিশেষত ও স্বকীয়তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ আলোচনা করা হল:

প্রথমত: নদীয়ার মন্দির-স্থাপত্যের রীতি ও শৈলী মিশ্র প্রকৃতির। এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মন্দিরের শৈলী আমাদের চোখে পড়ে।
যেমন আটচালা, চারচালা, দালান, পঞ্চরত্ন, জোড়বাংলা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়ত: এখানকার অধিকাংশ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন রাধাকৃষ্ণ। তবে বেশ কিছু মন্দিরে শিব, কালী প্রভৃতির পূজা হতেও
দেখা যায়।

তৃতীয়ত: নদীয়া জেলায় যে বহুল পরিমানে টেরাকোটা মন্দির দেখা যায়। এই সুন্দর সুন্দর মন্দিরগুলো কোন শিল্পীরা নির্মাণ করেছিলেন মন্দির গাত্রে তাদের নাম এবং পরিচয় সেভাবে পাওয়া যায় না।

চতুর্থত: এখানকার মন্দির গাত্রে বিচিত্র এবং অসংখ্য টেরাকোটার ফলক দেখা যায় সেগুলি হল: পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী, জ্যামিতিক নক্শা, নানান ধরনের ফুল ও পাতার মোটিফ নানান দেব-দেবীর মুখমণ্ডল প্রভৃতি।

পঞ্চমত: নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্যগুলি সবই কোন না কোন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল।

টেরাকোটা ফলকের মোটিফ ও বিষয়: লোকশিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মোটিফের পর্যালোচনা। মোটিফ হল লোকশিল্পের একটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী দিক, যা লোকশিল্পের ব্যাখ্যা দান করে এটি কোন চিহ্ন নয়, প্রতীক যার একটি অর্থ এবং ব্যাখ্যা আছে। লোকশিল্পের মোটিফকে আমরা সাধারণত পাঁচভাগে ভাগ করে থাকি যেমন: উদ্ভিদ জগৎ কেন্দ্রিক, প্রাণী জগৎ কেন্দ্রিক, সৌর জগৎ কেন্দ্রিক, জ্যামিতিক নক্শা, বিবিধ।
নদীয়া জেলার টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎ কেন্দ্রিক মোটিফ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এই সমস্ত মোটিফগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

উদ্ভিদজগৎ কেন্দ্রিক: উদ্ভিদজগৎ এর বেশ কিছু মোটিফ এখানকার মন্দির টেরাকোটায় ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে বিশেষ করে পদ্ম ফুল, ধানের শিষ, বিভিন্ন সর্পিল গতি ফুল, ফল, লতা, পাতা ইত্যাদি (চিত্র-১০-১২)।

প্রাণীজগৎ কেন্দ্রিক: প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রকার মোটিফ নদীয়ার মন্দির টেরাকোটায় ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব মোটিফগুলি হল: ময়ূর, হাঁস, গাই, বলদ, সিংহ প্রভৃতি।

সৌরজগৎ কেন্দ্রিক: সৌরজগৎ কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের মোটিফ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যেমন: সূর্য, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি।

জ্যামিতিক নক্শা: প্রায় সব ধরনের মোটিফের ক্ষেত্রেই জ্যামিতিক নক্শা মোটিফের ভূমিকা গুরূত্বপূর্ণ। কোন কোন জ্যামিতিক নক্শা মোটিফ অঙ্কনের ক্ষেত্রে যাদু বিশ্বাসের ভূমিকাও দেখা যায়। এখানকার মন্দিরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক নকশা কেন্দ্রিক মোটিফ পরিলক্ষিত হয় যেমন: চতুর্ভূজ, ত্রিভূজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, কমা, দাড়ি, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতি (চিত্র-১০-১৩)।

বিবিধ মোটিফ: উপরিউক্ত চারটি মোটিফ ছাড়াও আরও অজস্র মোটিফ আছে যেগুলি এখানকার টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই ধরনের মোটিফগুলি হল: বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ও পদচিহ্ন, নৌকা, নৌকার দাঁড়, পটচিত্র, পালকী, বন্দুক প্রভৃতি।

উপরিউক্ত মোটিফগুলি মন্দির গাত্রে টেরাকোটার ফলকে খেয়াল খুশি মতো ব্যবহৃত হয়নি। প্রতিটি মোটিফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, মনস্তাতিক অথবা যাদু বিশ্বাসকেন্দ্রিক কোন না কোন ধারণা নিহিত থাকে।

চিত্র-১০: পদ্মের মোটিফ

চিত্র-১১: উদ্ভিদজগৎ কেন্দ্রিক মোটিফ

চিত্র-১২: টেরাকোটার প্যানেলে নানা ধরনের মোটিফ

চিত্র-১৩: জ্যামিতিক নক্শাকেন্দ্রিক মোটিফ

বিষয়: শিল্প মাধ্যমের অবয়বের মূল কাঠামো থাকে তার বিষয় বস্তুর নিরিখে। যে কোন শিল্প মাধ্যমের কোন না কোন বিষয় থাকবেই। লোকশিল্পের যাবতীয় আঙ্গিকে নানা বিষয়ের সমাহার ঘটে চলেছে। এই সমাহারে সমাজজীবন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত নানা তথ্যের সমন্বয় ঘটে। বাংলার মন্দির টেরাকোটা শিল্পে বিষয় সম্ভার অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কোন অংশের কম নয়। সমাজজীবন থেকে আহুত বিষয় যেমন মন্দির টেরাকোটায় স্থান পেয়েছে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়। কখন কখন শিল্প আধারে উল্লিখিত ত্রিধারায় মিশ্রণ ঘটেছে। নদীয়া জেলায় অবস্থিত মন্দির টেরাকোটার ফলকগুলিতে একইভাবে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হল:

পৌরাণিক কাহিনী:

মন্দির টেরাকোটায় রামায়ণের কাহিনী: ষোল শতকের প্রারম্ভে সুলতানী আমলের অবসান ও মুঘল শাসনকালে সাধারণ মানুষের ভাব ও চিন্তা ধারায় যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার ফলস্বরূপ বাঙালি সংস্কৃতির এক নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। এই সময় থেকেই মন্দির টেরাকোটার ফলকে স্থান পেতে থাকে রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনীগুলির দৃশ্য চিত্র। এই সময় থেকেই মন্দির অলংকরণের মধ্যে রামকথা বা রামায়ণের বিশেষ বিশেষ কাহিনী অলংকরণের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে।

নদীয়া জেলার মন্দির টেরাকোটা সজ্জায় রামায়ণের যে বিশেষ কাহিনীগুলির চিত্ররূপ আমরা পাই সেগুলি হল ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, দশরথের পুত্রলাভ, রামের জন্ম ও হরধনু ভাঙা, সীতার বিবাহ, রাম-সীতা ও লক্ষণের বনগমণ। মারীচ বধ, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ ও যুদ্ধ, অশোকবনে হনুমানের সীতাদর্শন, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি। রামায়ণ কাব্যে এরূপ আরও বহু কাহিনী পাওয়া গেলেও উপরিউল্লিখিত আরও কয়েকটি বিষয় মন্দির টেরাকোটা শিল্পীদের উপর বিশেষ বিস্তার করেছিল।

এখানকার অধিকাংশ মন্দিরেই রামায়ণ কাহিনীর দৃশ্যচিত্রগুলি নিচের ভিত্তি সংলগ্ন মন্দিরগাত্রে অথবা প্রবেশ দ্বারে খিলানের উপর অবস্থিত। এর মধ্যে যে দৃশ্যচিত্রগুলি আমাদের নজর কাড়ে সেগুলি হল: বাণর সেনারা উর্দ্ধে লাফ দিয়ে রাবণের সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করছে, প্রায়ই রাক্ষস সৈন্যদের জড়িয়ে ধরে বা চুল টেনে নাজেহাল করেছে এবং প্রধান রাক্ষস যোদ্ধাদের ঘিরে ধরেছে, আবার ক্রীড়াছলে এককভাবে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা ফলকগুলির মূর্তির বেশভূষা, আকার ভাবভঙ্গীর মধ্যে দেবলীলার থেকেও সাধারণ শিল্পীদের নিজস্ব কল্পনার এক বিচিত্র সৃষ্টি সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

মন্দির টেরাকোটায় মহাভারতের কাহিনী: মন্দির টেরাকোটা ফলকের দৃশ্য চিত্রে রামায়ণের কাহিনী যতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল মহাভারতের কাহিনী ততটা জনপ্রিয় হয়নি। তবে রামায়ণের লঙ্কা যুদ্ধ যতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কাহিনী ততটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি মন্দির টেরাকোটা শিল্পে। ভীষ্মের শরশয্যা দৃশ্যটি মন্দির টেরাকোটায় একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ, এছাড়া মহাভারতের অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণের জন্ম, দুঃশাসন কর্তৃক দৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্র মন্থন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন ও গোপীদের বিলাপ দৃশ্য চিত্র পাওয়া যায় মন্দির টেরাকোটার ফলকে। শেষ মধ্যযুগের মন্দির টেরাকোটা ফলকে মহাভারতের প্রিয় বিষয় রূপে আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্য বেশী করে লক্ষ্য করি। এছাড়াও স্বল্প সংখ্যায় যুধিষ্ঠির ও দূর্যোধণের পাশা খেলারও দৃশ্য ফলকে দেখা যায়।

মন্দির টেরাকোটায় কৃষ্ণলীলার কাহিনী: রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় কৃষ্ণলীলার কাহিনীর দু'একটি দৃশ্য টেরাকোটা ফলকে ব্যবহার প্রথাগত হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে টেরাকোটা ফলকে দেখা যায় রাধা কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গোপীবিলাস দৃশ্য প্রভৃতি। বংশীবাদনরত শ্রী- কৃষ্ণ ও রাধার বহু ফলক আমরা লক্ষ্য করি। এই দৃশ্য ফলকগুলি কখনও সামনের দিক কখনও কানির্শের নীচে, কখনও বা থামের গায়ে নীচের দিকের দেওয়ালে অথবা দু'পাশের খোপে সাজান হত, অনেক সময় দেখা যায় কৃষ্ণকে কদম বৃক্ষতলে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গোপীদের সঙ্গে বিলাসরত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া আরো অপরাপর জনপ্রিয় দৃশ্যগুলি হল: নৌকাবিলাস, কালীয়া দমন। গোপীদের বস্ত্রহরণ প্রভৃতি।

বাংলার মন্দির টেরাকোটা শিল্পে কৃষ্ণলীলা দৃশ্যের বিলাস ব্যাপ্তির সঙ্গে অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি স্থান পেয়েছিল যেমন বিষ্ণু, বিষ্ণুর দশাবতার, শিব, দুর্গা, কালী, চণ্ডী প্রভৃতি। দুর্গা ও কালীর মূর্তি এককভাবে অধিকাংশ মন্দির ফলকেই দেখা যায়, দুর্গার দশভূজা মূর্তি এবং কার্ত্তিক গণেশাদিসহ দশভূজা মূর্তি বহু মন্দিরে দেখা যায়। বিষ্ণুর অবতারের চর্তুভূজ মূর্তির চারটি বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম স্থাপিত। উপরিউক্ত পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর দৃশ্য ফলকও দেখা যায়।

মন্দির টেরাকোটার ফলকে ঐতিহাসিক চিত্র: মন্দির টেরাকোটা ফলকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী একটি গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ষোল শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগীজরা ভারতে আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। পরে তাদের মধ্যে অনেকে জলদস্যুরূপে উপকূলবর্তী এলাকায় লুটপাট করতো। এ নিয়ে বহু টেরাকোটার ফলক তৈরি হয়েছিল। আঠারো উনিশ শতকের টেরাকোটায় যেসব যুদ্ধ দৃশ্যের ফলক দেখা যায় তাদের হাতে বন্দুক ও পরনে সাহেবী পোষাক, আবার কখন মুসলমানদের মতো আটোসাটো পোষাক ও মাথায় টুপি। মন্দির গাত্রের টেরাকোটার ফলকে দেখা যায় যোদ্ধারা ঘোড়া বা হাতিতে চড়ে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করছে। আবার কোন কোন প্যানেলে দেখা যায় পতাকাবাহী যোদ্ধা, হস্তী ও অশ্বারোহী সৈনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত এবং হাতি ও ঘোড়ার ওপর উপবিষ্ট প্রতাপশালী রাজাদের যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য। কোথাও কোথাও আবার নদী বা সমুদ্রতে রণতরী ও নৌযুদ্ধও দেখা যায়।

আঠারো শতকে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশেষভাবে ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ ও পর্তুগীজরা এদেশের নানা স্থানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কুঠী তৈরি করে বসবাস করতে থাকে। এদেশের মানুষের সঙ্গে মেলা মেশার ফলে কিছু কিছু এদেশীয় আচার আচরণ তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বহু টেরাকোটা ফলকে আমরা লক্ষ্য করেছি হুঁকো পানে ব্যস্ত অনেক সাহেবদের,

বন্দুকধারী ঘোড়া সৈন্যের দল কুচকাওয়াজরত, তাদের পরনে বিলীতী পোষাক ও জুতো। সাহেবদের রেল ইঞ্জিন চালানোর দৃশ্যও কোন কোন মন্দির ফলকে দেখা যায়। এছাড়াও নানান ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায় বাংলার নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মন্দির ফলকে।

মন্দির টেরাকোটা ফলকে সমাজ চিত্র: মন্দির অলংকরণে টেরাকোটা ফলকে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক দেব-দেবীর লীলা অবলম্বনে অসংখ্য ফলক দেখা গেলেও সামাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবিও খুঁজে পাওয়া যায়। সামাজিক চিত্রে দেখা যায় মানুষ ও তার জীবনধারার বিচিত্র অভিব্যক্তি। এই সমাজ চিত্রের মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা চিত্র, আমোদ প্রমোদ, শিকার, ভ্রমণ, নৌযাত্রা, দরবার গৃহ বা সভাগৃহ, নাচ-গান-বাজনা, অপরাধীদের শাস্তি বিধান, বন্য জীবজন্তু, গৃহপালিত প্রাণী, পাখী, সাধু সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, মিথুন দৃশ্য ইত্যাদি। টেরাকোটা ফলকে সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক সহজ সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এতে চিরন্তন মানবজীবনের সম্পর্কেরও চিত্র পাওয়া যায়।

৬. বর্তমান অবস্থা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ: পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভরা নদীয়া জেলার মন্দির-স্থাপত্য অনন্য ও বৈচিত্র্যময়। বর্তমানে আমাদের দুখেঃর বিষয় এই যে বিদেশে যেখানে মসজিদ ও গীর্জাগুলি খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় বর্তমান, সেখানে শিল্পকৃতির এই বিরল নিদর্শনগুলি অবহেলা-অনাদরে ভগ্ন, জীর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে দ্রুত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সংরক্ষণের অভাবে অনেক মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। স্থানীয় মানুষের ঔদাসীন্য আকাশছোঁয়া হলেও সরকার এদের সুরক্ষার বিষয়ে নীরব ও নিঃস্পৃহ। অপরূপ শিল্প সুষুমায় ভরা বহু মন্দির আজ ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে, মন্দির গাত্রে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা ফলকগুলি খুলে অন্যত্র বিক্রি করা হচ্ছে; এমনকি বহু অর্থের বিনিময়ে বিদেশে পাচার করছে পাচারকারীরা। মাঝে মাঝে সরকার দায়সারা গোছের দু'একটি মন্দিরে কাজ করেছে যার ফলে সূক্ষ টেরাকোটার কাজগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগও মন্দির-স্থাপত্য শৈলীকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। নদীয়া জেলায় সমীক্ষা করতে গিয়ে জানা যে পূর্বে নদীয়া জেলাতেও বহু উল্লেখযোগ্য মন্দির ছিল যার মধ্যে বর্তমানে অনেক মন্দিরই ধ্বংস প্রায় এবং বেশ কিছু মন্দিরের অস্তিত্ব আজ খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন দোগাছির শিব মন্দির।

৭. উপসংহার: নদীয়া জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত টেরাকোটা মন্দিরগুলির সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। এই মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় অধিবাসী এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। মন্দির সংলগ্ন স্থানীয় অধিবাসীদের দলবদ্ধভাবে মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করতে হবে। সরকারীভাবে মাঝে মাঝে দায়সারাভাবে সংস্কার করার ফলে টেরাকোটা ফলকগুলির সূক্ষতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই দক্ষ কারিগর দ্বারা সংস্কার করতে হবে। গ্রামের মন্দিরগুলির সংরক্ষণের দ্বায়িত্ব নিতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতকে আর শহরাঞ্চলের মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে পৌরসভাকে দায়িত্ব নিতে হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এই গৌরবময় প্রাচীন নিদর্শনগুলির সুরক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থায় করা হয় না। তাই রাজ্য সরকারকে মন্দির সংরক্ষণে আরও নজর দেওয়া উচিৎ। এছাড়াও পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ বেশ কিছু মন্দির সংরক্ষণের কাজ করলেও তাদের এ ব্যাপারে আরো বেশি যত্নবান হতে হবে যাতে গৌরবময় এই স্থাপত্য শিল্প হারিয়ে না যায়, যা বাংলার তথা বাঙালির অমূল্য সম্পদ।

তথ্যসূত্র:

১. স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নদীয়া, নবদ্বীপ-পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পৃ: ১৯-২০।

২. পূর্বোক্ত তথ্য নং ১, পৃ: ২৮।

৩. পূর্বোক্ত তথ্য নং ১, পৃ: ২৯-৩০।

৪. রায়, প্রণব, বাংলার মন্দিরঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, মেদিনীপুর, ১৯৯৯, পৃ: ১২-১৩।

৫. পূর্বোক্ত তথ্য নং ৪, পৃ: ১৫।

৬. পূর্বোক্ত তথ্য নং ১, পৃ: ২৮।

৭. পূর্বোক্ত তথ্য নং ১, পৃ: ২৭।

গ্রন্থপঞ্জী:

- ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর: শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিল্প শৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১২।
- ঘোষ, প্রদ্যোৎ, বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
- নদীয়া (জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ), কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩।
- মল্লিক, কুমুদনাথ (মোহিত রায় সম্পাদিত), নদীয়া কাহিনী, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮ (পুনর্মুদ্রণ)।
- মণ্ডল, সুজয়কুমার, লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, কলকাতা: নটনমকোলকাতা, ২০১১।
- মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ও অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫।
- বসু, শ্রীলা ও অভ্র বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৫।
- ভট্টার্চায্, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯।
- রায়, মোহিত, নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি, কলকাতা: পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫।
- রায়, প্রণব, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৯।
- চক্রবর্তী, রতনলাল, বাংলাদেশের মন্দির, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।
- হাসান, খন্দকার, মাহমুদুল, প্রাচীন বাংলার প্রত্নকীর্তি, ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১২।
- সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, বাংলার মন্দির, কলকাতা: কারিগর প্রকাশনী, ২০১৫।
- সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৮।
- স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নদীয়া, নবদ্বীপ-পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া।
- Bandyopadhyay, Sukhamay, Temples of Birbhum, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1984.
- Chowdhury, Saifuddin, Early Terracotta Figure of Bangladesh, Dhaka: Bangla Academy, 2000.
- Dasgupta, Prodosh, Temple Terracotta of Bengal, New Delhi: Crafts Museum, 1971.
- Deva, Krishna, Temples of North India, New Delhi: National Book Trust, 1986.
- Dey, Mukul, Birbhum Terracotta's, New Delhi: Lalit Kala Academy, 1959.
- Fergusson, J. History of Indian and Eastern Architecture (2nd ed.), London, 1910.
- George, Michell(ed.), Brick Temples of Bengal, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983.
- Ghosh, Sankar Prosad, Terracottas of Bengal, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1986.

- Mc Cutchion, David J, Late Mediaeval Temples of Bengal, Calcutta: The Asiatic Society, 1992.

পত্র-পত্রিকা:

- পশ্চিমবঙ্গ (নদীয়া জেলা সংখ্যা), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

অনুগবেষণাপত্র:

- ভট্টাচার্য, সংযুক্তা, নদীয়ার মন্দির টেরাকোটা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
- মুখার্জ্জী, তনয়া, মলুটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য: একটি পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষণ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

ওয়েবসাইট :

- https:\\en. Wikipedia.org\wiki\nadia,-India, viewed on 25.08.2015.
- travel.india.com> west Bengal, viewed on 30.08.2015.
- https://rangandatta.wordpress.com/tag/nadia/, viewed on 02.08.2015.
- http://www.aishee.org/tlist.php?count=11&region=Nadia, viewed on 30.08.2015.
- http://www.shristihousing.in/images/pdf/krishnagar-history-brochure.pdf, viewed on 02.09.2015.
- http://www.telegraphindia.com/, viewed on 10.10.2015.
- http://www.historyofbengal.com/rangan_datta/Shivniwas_Rangan_Datta.html, viewed on 05.1.2015
- http://nadia.gov.in/Tourism-Details/tourism-details.html, viewed on 26.02.2016.
- http://nadia.nic.in/Archaelogical_Assets/archaelogical_assets.html, viewed on 26.02.2016.